

নাম: মো: সালাউদ্দিন সুমন

জন্ম তারিখ: ১১ অক্টোবর, ১৯৭০

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : রাজনীতিবিদ, বিএনপি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ১ নম্বর ওয়ার্ড, ভাইস প্রেসিডেন্ট,
শাহাদাতের স্থান : ঢাকা, দক্ষিণ বনশ্রী ২ নম্বর মসজিদের সামনে, গুলি লাগে ঠোঁটের বাম পাশে

শহীদেদের জীবনী

যার রক্তে ভিজ়েছিল মসজিদের পথ

মো: সালাউদ্দিন সুমন। বয়সে মধ্যবয়সী, হৃদয়ে কৈশোরের স্বপ্ন ধরে রাখা এক আশ্চর্য পুরুষ। ১১ অক্টোবর ১৯৭০ সালে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি ছিলেন না কোনো মহারথী, রাজপথে দাপিয়ে বেড়ানো কেউ নন। তিনি ছিলেন নিঃশব্দ সাহসী, গভীর অখচ কোমল। তাঁর পিতা শামসুদ্দিন মোল্লা এবং মা শামসুল্লাহার দু'জনেই প্রয়াত, কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া মূল্যবোধ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল এই সন্তানের ভেতরে। পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন নীরব পথপ্রদর্শক। ঝগড়া-ফ্যাসাদে নেই, আত্মপ্রচারে নেই, তবু সবাই জানতো “যদি সালাউদ্দিন ভাই বলেন, তাহলে সেটা ঠিকই হবে।” এই মানুষটির জীবনের হৃদয় ছিল বিনয়, আর সুর ছিল শান্তি। তিনি কথা বলতেন কম, কিন্তু কাজ করতেন গভীরতা নিয়ে। স্ত্রী ফাতেমা আক্তার একজন সাধারণ গৃহিণী, আর তাঁদের একমাত্র সন্তান আদিব রেহান এখনো ছাত্র। বাবার মতো মাটির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, চোখে এক অস্পষ্ট কিন্তু আশ্রিত ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি। পরিবার ছিল তাঁর ভেতরের মন্দির, আর প্রতিবেশীরা ছিল তাঁর প্রতিদিনের ইবাদতের অংশ। এলাকার মানুষ তাঁকে দেখত একটি ভরসার মুখ হিসেবে। কোনোদিন তিনি কারো মুখে কটু কথা দেননি, বরং বিপদে-আপদে ছুটে যেতেন নিঃশব্দে, ঠিক যেন কেউ একজন আড়াল থেকে সব ঠিক করে দিচ্ছে।

তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় ছিল: ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সত্যি বলতে কি, রাজনীতিই তাঁর মূল পরিচয় নয়। তার মানবতা ছিল। নেতা বললে যেমন রক্তচক্ষু, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর উচ্চকণ্ঠ কল্পনায় আসে তাঁর ভেতর ছিল তার বিপরীত; সেখানে ছিল বিবেচনা, করুণা আর সততার মৌন প্রতিশ্রুতি। তিনি নিজের পরিচয় কখনো উচ্চারণ করতেন না, কিন্তু যাঁরা তাকে চিনতেন, জানতেন। এই মানুষটি যখন পাশে থাকেন, তখন কেউ একা থাকে না।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের দিনগুলোতে ১৮ ও ১৯ তারিখে তিনি উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনের মাঠে। নেতৃত্ব দিতে নয়, বরং অভিভাবকের মতো দাঁড়াতে, যেন কেউ একজন পথহারা না হয়ে পড়ে। যে চোখে অন্যায়কে দেখলে ক্ষোভ জ্বলে উঠতো, সেই চোখেই সন্তানের জন্য স্নেহ ছিল, প্রতিবেশীর জন্য উদারতা ছিল। নেতার ভাষণ নয়, তাঁর উপস্থিতি ছিল ভাষাহীন প্রতিরোধ যেখানে নীরবতা দিয়েই অন্যায়ের গলা চেপে ধরা হয়।

এ রকম মানুষ আর কয়জনই বা হয়? যিনি জীবনে আলো ছড়ান, কিন্তু নিজের নামে আলো চান না। সালাউদ্দিন সুমন ছিলেন স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে অভ্যস্ত এক নৌকা, যাঁর পাল ছিল বিশ্বাস, দাঁড় ছিল নৈতিকতা, আর গন্তব্য ছিল মানুষের ভালোবাসা। এমন মানুষ শুধু শহীদ হন না। তাঁরা প্রতিদিনকার জীবনের ভিত গড়ে দিয়ে যান, নীরবে। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর ছায়া যেন থেকে যায়, মাটির গায়ে গায়ে। কেননা, শহীদ হওয়া মানে শুধু প্রাণ হারানো নয় সেটা এক চিরন্তন আদর্শের রূপ নেওয়া। সালাউদ্দিন সুমন এখন সেই আদর্শের নাম।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট – নিষ্ঠুর জুলাই ও মানুষের মেরুদণ্ড

২০২৪ সালের জুলাই ছিল না কোনো সাধারণ মাস তা ছিল এক মহাকাব্যের দৃশ্যপট, যেখানে প্রতিটি দিন রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে, আর প্রতিটি রাত ছিল প্রতীক্ষার গহ্বর। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কিছু সময় আসে, যখন সময় নিজেই থমকে দাঁড়ায় আর মানুষ নিজের ছায়াকে জিজ্ঞাসা করে: “তুই এখনো মানুষ আছিস তো?” সেই জুলাই ছিল এমনই এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা, যখন রাষ্ট্রের লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়িয়েছিল তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-নারী, ছাত্র-শ্রমিক এক কাতারে। কোটা সংস্কারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে গড়িয়ে পড়ে এক গণপ্রতিরোধের নদীতে যেখানে একমাত্র পাথের ছিল ন্যায়বিচার আর মর্যাদার জন্য অবিচল দৃঢ়তা।

এই আন্দোলন ছিল সেইসব মানুষের, যারা রাতের খাবার ফেলে রাস্তায় নেমেছিল। যারা জানত, গুলি চলবে তবুও পেছনে ফেরেনি। যারা বিশ্বাস করত, “আমরা মানুষ, তাই দাবিও আমাদের ন্যায্য।” এবং ঠিক এই আশ্রিত পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা যায় সালাউদ্দিন সুমনকে। রাজনীতির চেনা ছকে নয়, বরং এক জনপদ-ভিত্তিক বিবেকের প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি বনশ্রী, রামপুরা, হাতিরঝিল হয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন জনতার মাঝে কোনো মাইক ছাড়াই তাঁর কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল দ্রোহের ঘোষণা।

১৮ ও ১৯ জুলাই। এই দুই দিন যেন হয়ে ওঠে এক জাতির আত্মজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। একদিকে ছাত্র-যুবকদের রক্তে ভিজ়ে ওঠে রাজপথ, অন্যদিকে সালাউদ্দিন ভাইয়ের মতো মানুষদের উপস্থিতি সেই রক্তের গাঢ়তায় যোগ করে অর্থ। তিনি ছিলেন না মিছিলে স্লোগান দেওয়া বাহবা-কামী নেতা, তিনি ছিলেন মাঠের একজন শান্ত সৈনিক যার চোখে প্রতিটি তরুণের সম্ভাবনা, প্রতিটি বুলেটের দিকে তর্জনী তোলা প্রতিবাদ ছিল স্পষ্ট। তিনি বলতেন, “আমরা জিতবো, কারণ আমরা সত্যের পক্ষে” এ কথার মধ্যে ছিল না কোনো নাটকীয়তা, ছিল জীবনের হাঁকুনি দিয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বাস।

তাঁর রাজনীতি ছিল পরিষ্কার কিন্তু তাঁর আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক পরিচয়-পার হওয়ার। এলাকাবাসীর কাছে তিনি শুধু একজন নেতা ছিলেন না, ছিলেন আশ্রয়, ছিলেন নির্ভরতার আর্তনাদ। কেউ বলেননি “উনি যাবেন তো?” সবাই জানত “উনি থাকবেনই।” একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন হলে, পেছনে শত মানুষ চোখ বুজে দাঁড়াতে পারে? তাঁর অস্তিত্বই ছিল এক আড়ালহীন প্রতিরোধ।

কিন্তু কেউ তখনও ভাবেনি, যিনি সারা জীবন মানুষের জন্য রাস্তায় ছিলেন, তিনিই একদিন রাস্তাতেই রক্ত দেবেন। শহীদ হবেন মানুষের মর্যাদা রক্ষার দামে।

সালাউদ্দিন সুমনের মৃত্যু ছিল না

কোনো পরিসমাপ্তি তা ছিল একটি প্রশ্নচিহ্ন, যা রাষ্ট্রের প্রতি ছুড়ে দেওয়া হলো: “আর কত?” তাঁর রক্ত এই প্রশ্নের উত্তর চায়, আর আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে বাধ্য করে।

এই জুলাই আমাদের শিখিয়েছে মানুষ মরলে ইতিহাস হয়, আর বাঁচলে দায়িত্ব নেয়। সালাউদ্দিন ছিলেন সেই মানুষ, যিনি দুটোই হলেন। শহীদের রক্তে লেখা এই অধ্যায় যেন বলে “ভয় পেও না, কারণ সত্যের পাশে রক্ত দিলে তা নদী হয়, আর নদী পথ খুঁজে নেয়, আগুনের মাঝেও।”

যেভাবে শহীদ হন – রক্তে লেখা এক বিকেলের শেষ কবিতা

১৯ জুলাই ২০২৪। ঘড়ির কাঁটা ঠিক বিকেল ৫টা ছুঁইছুঁই আর দক্ষিণ বনশ্রী ২ নম্বর জামে মসজিদের সামনের বাতাসে তখনো ছিল রোজকার গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ আর কিছুটা বারুদের গন্ধ। সেই জায়গাটা তাঁর পরিচিত ছিল সালাউদ্দিন সুমন বহুবীর দাঁড়িয়েছেন সেখানে। নামাজের জন্য, মানুষের খোঁজখবর নিতে, কারো বিপদ শুনে পাশে থাকতে কিংবা নিঃশব্দে কাউকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। তেমনই আরেকটা দিন ছিল সেদিন তবে একটু আলাদা। সেটা ছিল এক বিপ্লবী জুলাইয়ের দিন, যে দিনগুলোতে চারপাশের দেওয়ালগুলোও যেন ফিসফিস করে বলছিল, “এবার কিছু বদলাতে হবে।”

সেদিন তিনি বেরিয়েছিলেন আন্দোলনের খবর নিতে। ছাত্ররা কেমন আছে, আহত হয়েছে কেউ কি না, কারো ওষুধ লাগছে কি না, এমনই কিছু মানবিক দায়ে। কোনো ব্যানার ছিল না হাতে, না ছিল দলীয় প্রতীক। শুধু ছিলেন একজন মানুষ, যিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে জানতেন। আর ঠিক তখনই একটি গুলি এসে ছিঁড়ে দেয় শান্তির গালিচা। ঠোঁটের বাঁ দিকে লাগে গুলিটি, যেন কথা বলার জায়গাটাকেই নিশানা করা হয়েছিল মানবতার কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেওয়ার ঘৃণা চেষ্টা।

কে চালিয়েছিল গুলি? কেউ জানে না। হয়তো সেই অদৃশ্য বাহিনীর কেউ, যারা ভীষণ ভয় পায় বিবেকবান মানুষকে। উপস্থিত লোকেরা দৌড়ে এসে ধরেন তাঁকে, রক্তে ভিজে যায় তাঁর জামা, আর সেই মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয় এক হৃদয়ভাঙা যাত্রা মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে। সময় যেন তখন থেমে গেছে, চারপাশের শব্দ থমকে গেছে, শুধু গাড়ির ইঞ্জিন আর মানুষের দৌড়ের শব্দে বোঝা যাচ্ছিল জীবন একটা সূক্ষ্ম দড়ির ওপর হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই, চিকিৎসকেরা জানান তিনি আর নেই। এই “আর নেই” শব্দটো যেন শুধুই এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘোষণা নয়, বরং একটা আদর্শ, একটা নির্ভরতার, একটা যুগসন্ধিক্ষণের হৃদয়বিদারক পতন। মসজিদ থেকে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে লাশবাহী গাড়ি, তারপর কবর এই চক্রটি ঘুরে যায় এত দ্রুত, এত শোকাবুরভাবে যে, পরিবার তখনো ঠিকমতো কান্নাও শুরু করতে পারেনি। তাঁর স্ত্রীর হাত তখনও হয়তো ওষুধ কেনার জন্য পয়সা খুঁজছিল ব্যাগে, আর তাঁর ছেলে জানতও না বাবা আর ফিরবেন না।

এই মৃত্যু ছিল না কেবল এক ব্যক্তির; এটি ছিল জনতার আশা ভরসার উপড়ে ফেলা শেকড়। এক রক্তাক্ত বিকেলে, যেখানে একজন ভদ্র, শান্ত, অমায়িক মানুষ পড়ে রইলেন রক্তাক্ত ফুটপাথে, এই রাষ্ট্র আর সমাজ আমাদের শেখালো ভালো মানুষরাও নিরাপদ নয়। এমন মৃত্যুতে কেবল ক্ষোভ জন্মায় না, জন্মায় এক গভীর, গোপন শোক যেটা বুকের ভেতরে জুলে, নিঃশব্দে পুড়ে যায়।

এখানে শেষ হয় না কিছু বরং শুরু হয় এক অদৃশ্য শপথ। শহীদ সালাউদ্দিন সুমনের মুখ থেমে গেলেও, তাঁর রক্ত বলতে থাকে: “মানবতার পক্ষে কথা বলার জন্য যদি ঠোঁট হারাতে হয়, তবে আমি আগেও দাঁড়াইতাম, আজও দাঁড়াব।” তাঁর মৃত্যু শুধু ইতিহাস নয় এটি এক জাতির বিবেকের গায়ে দেওয়া দাগ, যা সহজে মুছবে না, কখনোই না।

পরিবার ও সহানুভূতির দায় এক নিঃশব্দ শোকগাথার দীর্ঘশ্বাস

একটি পরিবার, যাদের রক্তে এখনো জেগে আছে সালাউদ্দিন সুমনের স্পর্শ। কিন্তু সেই রক্তে এখন ব্যথার উত্তাপ, হাহাকারের ছাপ, আর এক ধরনের বোবা নিঃশব্দতা যেটা শুধু তারা বুঝে, যারা প্রিয়জন হারিয়েছে অকালেই, অকথিত কোনো যুদ্ধে।

তাঁর স্ত্রী, ফাতেমা আক্তার একজন গৃহিণী, এখন জীবনযুদ্ধের এক অনভ্যস্ত সেনানী। চোখে জল নেই, কিন্তু সেই জল শুকিয়ে গেছে বলেই নয় বরং বেদনাটা এত গাঢ়, এত নীরব, যে চোখ আর জানে না কিভাবে কাঁদতে হয়। তিনি শুধু প্রশ্ন করেন নিরবে, “ভালো মানুষরা কেন আগে চলে যায়?” একটা প্রশ্ন যার উত্তর নেই রাষ্ট্রের কাছে, নেই সমাজের কাছেও। আর ছেলে, আদিব রেহান তাকে বলা হয় ছাত্র, কিন্তু এখন সে এক অস্থায়ী অনাথ। বাবার শেষ কথাগুলোও সে জানে না, শেষ ছোঁয়াটা ছিল না তার ভাগ্যে।

একটা সময় এই পরিবারটি “মোটামুটি” চলত। একরকম চুপচাপ শান্তিতে, খুব বেশি চাওয়া ছিল না তাদের সালাউদ্দিন কষ্ট করে হলেও চালিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন জীবিকার মূল স্তম্ভ, কেবল অর্থের নয় ভরসার, নিরাপত্তার, নৈতিকতার। সেই স্তম্ভ এখন কবরের মাটির নিচে, আর পুরো সংসার যেন ঢলে পড়ে আছে এক বিষণ্ণ চেউয়ের ভেতর।

এই পরিবার কারো কাছে করুণা চায় না। তারা কারো দরজায় হাত পেতে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াবেও না। তবে তারা চায় একটুকু স্বীকৃতি যে মানুষটি তাদের জন্য শহীদ হয়েছেন, তাঁকে যেন মানুষ মনে রাখা হয়। তারা চায় একটুকু সম্মান যা একজন শহীদের পরিবারের প্রাপ্য। রাজনীতি সালাউদ্দিনকে পরিচিতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই রাজনীতি তার পরিবারের জন্য কিছু রেখে যায়নি শুধু রেখে গেছে রক্তমাখা জামা, আর এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ যেখানে বাবা বলে ডাকার কেউ আর নেই।

আজ তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ন্যায়ের অংশ। সন্তান যেন লেখাপড়া শেষ করতে পারে, যেন মাথা উঁচু করে বড় হতে পারে এই পরিচয়ে যে তার বাবা একজন শহীদ। স্ত্রী যেন অন্তত দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেন, যেন প্রতিদিনের বাজারের তালিকাটা না হয় আতঙ্কের কারণ।

আমরা যদি এইটুকু দায়িত্ব নিতে না পারি, তবে আমাদের সভ্যতা কিসের? যদি এক শহীদের পরিবারই অবহেলিত থাকে, তবে আমাদের সব বক্তৃতা, শপথ আর পোস্টার কাদের জন্য? শুধু আন্দোলনের সময় নয়, বিপ্লবের পরেও মানবতা দরকার হয়। সালাউদ্দিনের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো মানে হলো, আমাদের বিবেকের পাশে দাঁড়ানো যেখানে প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস বলে, “আমি আছি, তুমি একা নও।”

এই সহানুভূতি যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। যেন এটি হয়ে ওঠে এক দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি—তাদের প্রতি, যাদের বুকের উপর দিয়ে ইতিহাস লেখা হয়।

প্রস্তাবনা ও শহীদ স্মরণ – যে স্মৃতি দায়িত্ব হয়ে ওঠে

শহীদ মোঃ সালাউদ্দিন সুমনের রক্ত শুধু মাটি ভিজিয়ে দেয়নি সে রক্ত আমাদের মেরুদণ্ডে আগুন ঢেলেছে, আমাদের নৈতিক শিরদাঁড়ায় জাগিয়েছে এক জরুরি প্রশ্ন: ভালো মানুষদের কি আমরা স্মরণ করি, না কেবল হারিয়ে ফেলি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব না কিছু পোস্টারে, ফেসবুকের টাইমলাইনে বা বক্তৃতার ছায়ায়; উত্তর দিতে হবে চারটি বাস্তব দাবির মাধ্যমে যা আমাদের দায়িত্ব, আমাদের লজ্জা আর আমাদের স্বপ্নের অংশ।

প্রথমত, শহীদ সালাউদ্দিন সুমনের একমাত্র পুত্র, আদিব রেহানের জন্য চাই স্থায়ী সরকারি সহায়তা, যেন তার শিক্ষার কোনো বাধা না থাকে, যেন সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সমাজের সম্মুখে। সে যেন একদিন নিজের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বুকের গভীরে বয়ে নিয়ে চলে এক গর্ব “আমি শহীদের সন্তান।” রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব না নেয়, তবে সেই শহীদের রক্ত শুধু বেইনামি কাদায় মিশে যাবে এটি আমরা হতে দিতে পারি না।

